পুণ্যপদপরশে

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমমদিরাতৃপ্ত রসিক

গৌরী ভৌমিক

দক্ষিণেশ্বরের একটি অনুপম চিত্রপট—যা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনুধ্যানের বিষয়—শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তসমাগম, চলেছে কীর্তনাদি, ভক্তপ্রাণে ঠাকুরের কথামৃতসেচন, অমৃতনিস্যন্দী গান, ভাবাবেশে নৃত্য, কখনও বা গভীর সমাধি। অদূরে নহবতের দরমার বেড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে 'বিন্দুবাসিনী'র উঁকিঝুঁকি, কখন একটু দর্শন লাভ হয় সেই পরমপুরুষের! এ-চিত্র শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনীপাঠকমাত্রেরই কল্পনায় সহজেই উদিত হয়।

একই সময়ে সেখানে নিভৃতে রচিত হয়ে চলেছিল শ্রীরামকৃষ্ণলীলা অনুধ্যানের আর একটি চিত্রের প্রেক্ষাপট। আরও দুটি চোখ নিঃশব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সদা অনুসরণরত। শ্রীরামকৃষ্ণ পোস্তায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন বা গঙ্গাতীরে পাদচারণ করছেন, পঞ্চবটীতে বা বেলতলায় ধ্যানরত, কখনও ভক্তের মজলিশে বা ঝাউতলার পথে, কখনও বা হাঁসপুকুরের বাঁধানো ঘাটে কারও সঙ্গে আলাপচারিতায়। আর সেসময়ে তাঁকে অনুসরণকারী দুটি চোখে কখনও দর্শনের আনন্দ, কখনও নিজের নিরুপায় রিক্ততার অনুভবে চোখদুটি সজল, আবার কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের ঝাউতলায় যাওয়ার পথে তাঁর পদচিহ্নে মাথা ঘষে তাঁকে অনুসরণ।[১] এত ভক্ত, এত পাপীতাপী তরে যাচ্ছে, 'প্রেমধন বিলায় গোরা রায়'। সে শুধু বঞ্চিত। যে-জন্মের ওপর তার কোনও হাত ছিল না, তারই জন্য সে আজ অন্ত্যজ।

জাতিতে সে মেথর। মানুষের গড়া সমাজে তার স্থান সবচেয়ে নিচে। রানি রাসমণির কালীবাড়ি সাফসুতরো রাখাই তার কাজ। নিত্য ভক্তসমাগমে জমে ওঠা জঞ্জাল সে দুহাতে পরিষ্কার করে। ঝাঁটা বালতি নিয়ে কালীবাড়ি সংলগ্ন নর্দমা, শৌচালয় সে পরিষ্কার রাখে। এর জন্য সে বেতনও পায়। কিন্তু এই কাজটুকুর বাইরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে তার যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত। কারণ প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদি অনুযায়ী ''যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এইরূপ নীচজাতির মুখ দেখিয়া ফেলে, তবে তাহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া একসহস্র গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।''[২] এই মানুষগুলি নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে পূর্বজন্মের পাপের ফল মনে করে নীরবে মাথা পেতে নিয়ে তার ক্ষয়সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যেত জীবনভোর।

তার নাম রসিক। একমাত্র পরিচয় 'রসিক মেথর'। শ্রীরামকৃষ্ণের অনবদ্য উচ্চারণে 'রস্‌কে'। নামটি তার ভারি তাৎপর্যময়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন 'রসো বৈ সঃ'—

ম্যুরাল চিত্র : শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে রসিক, শিল্পী : রমেশ পাল

সাহস জুগিয়েছিল একদিন সব আগল ভেঙে ফেলতে। সেদিন সে নিপতিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে। তার চোখের জল মিশে গেল শ্রীচরণচ্যুত ব্রহ্মবারিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় সমাধিতে প্রবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ। বিশ্বদেবতার গ্যালারিতে অনুপম সৌকর্যে নির্মিত হয়ে গেল একটি অনবদ্য ম্যুরাল, যা ভবিষ্যতে শোভাবর্ধন করবে 'রসিক ভিটা'র প্রবেশদ্বারের।*

কালীবাড়ির বাগানের

তিনি রসস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ এই ঈশ্বরকে যিনি আস্বাদন করেন তিনিই প্রকৃত রসিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।'' অর্থাৎ ভক্তমন ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদত্ব অনুভবের শুষ্কতায় বিলীন হতে চায় না, বরং রসেবশে থাকতেই ভালবাসে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই রসের কারবারি। অহেতুক কৃপাবশে ভেদজ্ঞানরহিত হয়ে তিনি তা বিতরণ করেছেন। সেই কৃপাকণা ধারণ করে রসিক তার পিতামাতার প্রদত্ত নামের সার্থকতা লাভের অধিকারী হয়েছে।

ছুঁচে কাদা থাকলে তাকে চুম্বকে টানে না। কিন্তু কাদা জলে ধুয়ে গেলে চুম্বকে টেনে নেয়। রসিকের যা কিছু ময়লা সব চোখের জলে ধুয়ে গিয়েছিল। তার ব্যাকুলতা, সান্নিধ্যলাভের আকুতি, মনের শুচিতা তাকে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের চৌম্বকক্ষেত্রে এনে ফেলেছিল। অনুমান করি কেউ তাকে শুনিয়েছিল জগাই-মাধাইয়ের উত্তরণের কাহিনি কিংবা জাবাল-সত্যকাম কথা, যা তাকে

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদূরেই রসিকের ভিটেবাড়ি। অবশ্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ সে-পাড়া মাড়ায় না। তবে এরা তো নিছক 'কলে ফেলে তৈয়ার' করা মানুষ, আর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর 'নিজের হাতে গড়েছেন'। তাঁর সবকিছুই আলাদা। এমনকী ধ্যানকালেও তাঁর ঈশ্বরে নিবিষ্ট মন একদিন চলে যায় রসিকের বাড়ি। বলছেন, ''ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ি! রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা ওইখানে থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুল-কুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র!''[৩] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখি, ''একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।''—সেই এক ঈশ্বরই সর্বরূপে বিরাজিত, সর্বব্যাপী, সর্বজীবে অধিষ্ঠিত—যা শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। জাগতিক দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে তিনি সবকিছুর মধ্যে অখণ্ড ব্রহ্মদর্শন করতেন। বলতেন তাঁর অনুভবের কথা :

*রসিক ভিটা আজ শ্রীসারদা মঠের অধীনে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি পীঠ', প্রধানত কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র।

''গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের... খোলের ভেতরে যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্বত সব খোলগুলোর ভেতরেই সেই এক অখণ্ডসচ্চিদানন্দ রয়েছেন।... মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারচেন!''[৪]

কামারপুকুরের ধনি কামারনি, চিনু শাঁখারি, শ্রীনাথ বাগদি, ভূতনাথ বাগদি, মধু যুগী, কুঞ্জ ডোম—এদের কথা রসিকের জানার কথা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাল্যজীবন থেকেই বন্ধু নির্বাচনে সমাজসৃষ্ট ছুৎমার্গ মানেননি, এমনকী দ্বিজত্বলাভের পুণ্যলগ্নে ভিক্ষামাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ-সমাজের বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করেননি, এই খবরও নিশ্চয় তার কাছে ছিল না। হয়তো কালীবাড়ির পরিচারিকা 'বৃন্দে ঝি' মারফত বা লোকমুখে একথা তার কানে পৌঁছেছিল যে, এই সমদর্শী দেবমানবের স্নেহের ভাগ সকলের জন্যই আছে। তার সরল প্রাণ এটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিল যে এ-মানুষটি অন্য আর পাঁচটা মানুষের মতো হিসেবি বুদ্ধি ধরেন না। তাই তো তার খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতো হেসে তার সঙ্গে কথা কইতে পারেন অনায়াসে। প্রত্যক্ষদর্শী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, ''যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন, 'থাক বুঝেছি, মদটা একটু কম করে খাস।' সে লুটিয়ে পড়ে বলত, 'কে দেবে ঠাকুর, ভাগ্যে নটবর পাঁজার মা মরেছিল! কাদের মা আর রোজ মরছে।' ''[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনেও যে এই রসিকের একটি ভূমিকা ছিল, একথা আজ সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে এ-তথ্য স্বীকৃত। সাধনার প্রথম চার বছরে (১২৬২-১২৬৫ বঙ্গাব্দ) সাধনার অন্যতম অঙ্গরূপে তিনি লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক ও নিন্দা—এই অষ্টপাশ ছেদনে তৎপর হয়েছিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, ও শূদ্র'—এই জাত্যাভিমান ত্যাগ করতে সমাজের সর্বনিম্ন পেশা মেথরের কাজ নিজে করে অভেদবুদ্ধি আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন, ''মেথরের প্রতিও যাহাতে তাঁহার ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া তাহাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া মন্দিরের নর্দমা, পায়খানা প্রভৃতি নিজহস্তে পরিষ্কার করিতেন এবং পরে নিজ দীর্ঘকেশ দ্বারা সেই স্থান মুছিয়া দিতেন।... তাঁহার ভাব এই ছিল : আমি যে যথার্থই সমগ্র মানবজাতির সেবক হইয়াছি, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাকে তোমার বাড়ির ঝাড়ুদার হইতে হইবে!'' শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন, ''মা, আমাকে ঐ মেথরের সেবক কর, আমি যে এমনকি মেথরের চেয়েও নীচু তা আমাকে অনুভব করতে দাও।''[৬] রসিকই সেই উক্ত মেথর, যার গৃহাঙ্গনের আবর্জনা ঠাকুর নিজ হাতে দূর করেছিলেন। শ্রীম-র উক্তি : ''ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি নিজের মাথার চুল দিয়ে রস্‌কে মেথরের বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করেছিলেন। আর কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'মা, আমি ব্রাহ্মণ, এই অভিমান বিনাশ কর'!''[৭]

যদিও সামাজিক অনুশাসনের কোনও অচ্ছেদ্য নিগড়ের বাঁধন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করেননি, তবু এ-কাজ তাঁকে করতে হয়েছে গভীর রাত্রে একান্ত সংগোপনে, সকলের অলক্ষ্যে। এর কারণ প্রথমত, রসিক জানতে পারলে কোনওমতেই তাঁর অষ্টপাশ ছেদনের সাধনায় এতটা উদার সহায়তা করতে রাজি হত না। তাঁকে নিবৃত্ত করতে কেঁদে কেটে হয়তো অনর্থ বাধাত। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণসন্তান। তদুপরি রানির মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর এহেন সাধনা সাধারণের চোখে খামখেয়ালিপনা ছাড়া আর কিছু নয়। লোক-জানাজানি হলে রানি বা তাঁর জামাই সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে শ্রীরামকৃষ্ণকে

জনরোষ থেকে বাঁচাতে পারলেও, অসহায় রসিককে তাঁরা সমাজের রোষদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারতেন না। একথা শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা ছিল না।

নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছেও রসিকের আনাগোনা ছিল। 'বাবা'র অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ যাতে হয়, এজন্য রসিক তাঁর কাছে আবদার জানাত। শ্রীশ্রীমা তাকে আশ্বাস দিতেন। শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর 'সারদা রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে আমরা এর উল্লেখ পাই। রসিক আশ্বস্ত হয়ে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির অপেক্ষা করত।

অচিরেই আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করে ধন্য হয় রসিকের জীবন-মরণ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কথায় উক্ত ঘটনার বিবরণ : ‘‘রামলালদাদার কাছে শুনেছিলুম ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা : রসিক মেথর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে কাজ করতো। ঠাকুরকে সে প্রতিদিন দূর থেকে দেখতো, কত লোক তাঁর কাছে আসছে যাচ্ছে। [রসিক ভাবত] ইনি সবাইকে দয়া করছেন, —আর আমার এমনই কপাল যে এত কাছে থেকেও এঁর একটু চরণধুলো নিতে পাই না। ভেবে ভেবে তার বুকের ভেতর ঝড় বইছে, প্রাণে শান্তি নেই। এইভাবে দু-চার বছর যায়। তারপর শুভক্ষণ এলো। একদিন রামলালদাদা দাঁড়িয়ে আছেন—ঠাকুর শৌচে গেছেন, এখনই ফিরবেন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রসিক ভাবছে : 'আজ ভাগ্যে যা আছে হোক, আর সইতে পারছি না।' একটু পরে ঠাকুর নহবতের কাছে আসতেই সে মাটিতে লুটিয়ে তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমার কী হবে?' কথাটা শুনে ঠাকুর চমকে উঠলেন, পরক্ষণে সমাধি। ঐভাবে অনেকক্ষণ কাটলো। রসিকের চোখের জল তাঁর পায়ে ঝরে পড়ছে। তার জীবনের সব গ্লানি, প্রাণের যত জ্বালা সব ধুয়ে যাচ্ছে। সমাধি থেকে নেমে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোর সব হলো।'... রসিককে কৃপা করলেন।... ত্রৈলোক্যবাবু তার সব বন্দোবস্ত করলেন, আর তাকে মেথরের কাজ করতে হয়নি।’’[৮]

ভাবতে ভারি অবাক লাগে, কোন অমোঘ আকর্ষণে রসিককে কৃপাদান করতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে প্রবিষ্ট হন! একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, রসিকের ক্রমবর্ধমান অধ্যাত্মপিপাসা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ অনবগত ছিলেন না। রসিকের দুটি চোখ যে নিয়ত আকুল প্রাণে তাঁকেই অনুসরণ করছে, প্রতিদিনের বিবিধ যাপনের মাঝে রসিকের মনের নিক্তির কাঁটাটুকু যে তাঁরই অভিমুখে স্থির, একথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন। আমরা জানি, তাঁর কাছে অন্তরঙ্গ ভক্তদের আসার পূর্বাভাস তিনি পেতেন। এমনকী সাধারণ ভক্তদের মধ্যেও কে 'এখানকার', আর কে 'থাকবে না' তা তিনি অনেক সময় সরাসরি বলে দিতেন। কাজেই, সহজেই ধরে নেওয়া যায় রসিকের ব্যাকুলতাও তাঁর অবিদিত ছিল না। সর্বোপরি, আজ আমরা রসিক সম্পর্কে যতটুকু জানি তার উৎস কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। সামান্য মেথর রসিকের নীরব সাধনার কথা তিনি না জানালে, কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তিনি হয়তো বা অপেক্ষা করছিলেন রসিকের পূর্ণ শরণাগতির পাত্রতা লাভের। তাই তার আত্মসমর্পণের মুহূর্তে তিনি নিজের ভাগবত সত্তায় প্রবিষ্ট, সমাধিস্থ। কারণ তিনি জানতেন, এই পরম মুহূর্ত একদিন আসবেই।

স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দু বুকে নিয়ে শুক্তি ডুব দেয় অতল জলে। সেখানে নিভৃত সাধনে সে তার অন্তরে লাভ করে অমূল্যরতন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করে রসিকের জীবনের বাকি দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছিল। শুরু হয়েছিল তার একান্ত সাধনা। নিজের বাড়িতে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই সে সাধনভজন করত। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণকেও অচিরেই দক্ষিণেশ্বর থেকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যেতে হয়। নরতনুতে

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসা তাঁর আর হয়ে ওঠেনি। রসিকের ভাগ্যে তাঁর পুনর্দর্শন ঘটেছিল কি না জানা যায় না। আমরা অনুমান করতে পারি জীবন্ত ইষ্টের অদর্শনে রসিকের মর্মব্যথা। শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হলে সেই সংবাদ সে অবশ্যই পায়। তারও জীবনবেলায় ভাটার টান শুরু হয়। সে একেবারে মুষড়ে পড়ে। তার শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। কাজকর্ম আর করতে পারে না। ক্রমশ নিকটবর্তী হয় অন্তিম লগ্ন। একদিন সকালে স্ত্রীকে রসিক বলে ছেলেদের ডেকে তাকে তুলসীতলায় শুইয়ে দিতে। পরের অংশটুকু স্বামী শিবানন্দজীর বর্ণনায় : ''যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে, তার মুক্তি অনিবার্য। ... [রসিককে] ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভয় নেই, তোর হবে; মৃত্যুসময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বেই রসিক বলে উঠল—'এই যে, বাবা, এসেছ। বাবা, এসেছ!' এই বলতে বলতে মারা গেল।''[৯] শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার দু-বছরের মধ্যেই রসিকের জীবনাবসান হয়।

এই হল দক্ষিণেশ্বরের মেথর রসিকের কাহিনি, যা আমাদের মনে অনিবার্য এক প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়। রানি রাসমণির কালীবাড়িতে তো একা রসিক নয়, তার সমগোত্রের বা তার চেয়ে উঁচু পদমর্যাদার আরও অনেকে ছিল, যারা নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছে। এমনকী ভোগের লুচিও হয়তো প্রসাদ পেয়েছে। তাদের সকলেরই কি এমন মুক্তি হয়েছে? আমরা জানি না। তবে আচার্য শংকর তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে মুক্তির জন্য আবশ্যিক তিনটি জিনিসের দুর্লভ সংযোগের কথা বলেছেন : 'মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।' শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালে কামারপুকুর বা দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য অধিবাসিবৃন্দের এর মধ্যে দুটির সংযোগ ঘটলেও মুমুক্ষুত্বের বাসনা তাদের সকলের মধ্যে জাগেনি। রসিকের মতো দু-একজনেরই তা জেগেছিল। তারা সৌভাগ্যবান।

তবে এ-প্রশ্নের সরল সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দিয়েছেন : ব্যাকুলতা থাকলে ঈশ্বরের কৃপা হয়। ''তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে—সাধনা করতে করতে তবে কৃপা হয়।''[১০] ''মাগছেলের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।''[১১] রসিক কেঁদেছিল। পুত্র-পরিজন বা বিষয়সুখের জন্য নয়, ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য। তার ধ্যান-জ্ঞান-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে লাভ করার ব্যাকুলতায় রসিকের চোখের জলে সিক্ত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের মাটি। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাধন্য রসিক-ভিটা তাই আজ এক পরম তীর্থ। ✠

তথ্যসূত্র

১। *স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা* (রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম : উঃ ২৪ পরগণা, ২০০১), পৃঃ ২৮
২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), খণ্ড ৮, পৃঃ ২৫২-৫৩
৩। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), পৃঃ ২৭১
৪। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ২, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ৮৬
৫। *উদ্বোধন* পত্রিকা, ৫০ তম বর্ষ, পৃঃ ৭২
৬। স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯), পৃঃ ২৬৫
৭। *শ্রীম-দর্শন* (শ্রীম ট্রাস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট : চণ্ডীগড়, ২০০৯), খণ্ড ৭, পৃঃ ১৬৭
৮। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, *সৎপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১), পৃঃ ৪৬
৯। *শিবানন্দ-বাণী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ২, পৃঃ ৭৫
১০। *কথামৃত*, পৃঃ ৬৪
১১। তদেব, পৃঃ ২১